International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-VII, Issue-IV, July 2021, Page No. 28-42
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v7.i4.2021.28-42

মহাকাব্যের গান্ধারী: দীপক চন্দ্রের নবনির্মাণ

অংকিতা সাহা
গবেষক, বাংলা বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর

Abstract:

Ancient epics have always carried the pattern of a nation's overall heritage. They are analyzed through various arguments to fit the requirement of the time. The Indian epic Mahabharata has been discussed by writers and researchers from different perspectives on various branches of literature, as well as applied various thoughts on the events or characters of the Mahabharata. The kind of thinking and contemplation that started in Bengali literature about the original epics after the era of translation is really amazing. In this context, the first person whose name comes to mind in Bengali literature is Bankimchandra Chattopadhyay, the literary emperor. Then, from Michael Madhusudan, Rabindranath Tagore to Buddhadeb Bose, Manaj Mitra, Nrisingha Prasad Bhaduri and many others have given thoughtful interpretations of the Mahabharata in various genres of literature, sometimes re-creating the Puranas. Fiction writer Deepak Chandra is unique here. His discussion and criticism of fiction in ancient Indian mythology, especially epics, has opened a new genre in the field of literary writing in the vast context of mythological novels.'Gandhari'- one of the characters of Mahabharata's character was reconstructed in one of his novel 'Gandhari, Kurukkhetrer Gandhari'. Without Gandhari, the story of Mahabharata would have been different. But Vyasadeva's apathy to that character was perplexing and Deepak Chandra saw it as a conspiracy. Why did Gandhari keep her eyes closed all her life? Also there are many other questions too. How was Gandhari's relationship with Kunti? Why is she so detached and apathetic about his family? Even her coldness and inadvertence about her own sons work. In spite of this, Kunti was very conscious and aware of her sons. So there is a huge difference between Gandhari and Kunti's behaviour. Deepak Chandra's novel tries to provide answers to all such questions. He tried to fill in the gaps in the narratives of the Mahabharata. One thing is clear that, Gandhari in the Mahabharata had many doubts in her mind; Deepak Chandra's Gandhari was at least somewhat self-conscious. This article tries to analyze reconstruction of the character of Gandhari by the novelist through a combination of argumentation and literary aesthetics.

***Keywords**: **Mahabharata, Family Politics, Gandhari's blindfoldness, Victim of Inperceptible Politics, Refelects Today's era**.*

মহাভারত সম্পর্কে একটা কথা প্রচলিত আছে, যা নেই ভারতে, তা নেই ভারতে। আসলেই বহু বিচিত্র কাহিনীর আখ্যান হল মহাকাব্য মহাভারত। আর সেই প্রাচীন মহাকাব্য হল চরিত্রদের রঙ্গশালা, যেখানে একের পর এক শক্তিশালী চরিত্রেরা ভিড় করে রয়েছে। আবার প্রধান চরিত্রগুলির ভিত হিসেবে দাঁড়িয়ে রয়েছে এমন কিছু চরিত্র যারা প্রথম সারিতে না এলেও মহাকাব্যের অনেক বড় বড় দায়িত্ব সামলেছেন। এদের সংখ্যাটা তুলনামূলক বেশি। সেরকম চরিত্রদের নিয়ে অনবদ্য নবনির্মাণে মেতেছেন সাহিত্যজগতের বিশিষ্ট স্বনামধন্য কথাসাহিত্যিক *দীপক চন্দ্র*।[১] চরিত্রের মহারণ্য থেকে বিশেষ কিছু চরিত্র এবং ঘটনা নির্বাচন করে মহাভারত ও এর বিশিষ্ট চরিত্রগুলির মনের অন্তর্জালকে ছিন্ন করতে চেয়েছেন; চেয়েছেন মহাকাব্যের দু'লাইনের মাঝে চাপা পড়ে যাওয়া বিশ্বাসযোগ্য সম্ভাবনাগুলোকে খুঁজে বের করে যুক্তিগ্রাহ্য করে তুলতে। একটি পরিবারের নামের নেপথ্যে গোটা ভারতের যে সাম্রাজ্য রাজনীতি ও কূটনীতি কাজ করেছে, তার লক্ষণগুলো বহন করছে মহাভারতের চরিত্রেরা। দীপক চন্দ্রের সাহিত্য সন্ধান করেছে মহাভারতের অন্তবর্তী সেই রহস্যের। তাঁর এই কাজে একদিকে মহাভারতের চরিত্রগুলো যেমন নবনির্মিতি লাভ করেছে, তেমনি মহাভারতের ফাঁকগুলো ভরাট হয়েছে যুক্তি-বুদ্ধির বিশ্বস্ততায়।[২]

ভারতীয় মহাকাব্য মহাভারতকে নিয়ে সাহিত্যিক, গবেষকেরা নানা দৃষ্টিকোণে সাহিত্যের নানা শাখা ধরে যেমন আলোচনা করেছেন, তেমনি মহাভারতের ঘটনা বা চরিত্রকে ধরে নানা চিন্তাভাবনার প্রয়োগও ঘটিয়েছেন। মহাভারতের অনুবাদ অনুশীলন-কর্মের পরবর্তীতে বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে এপ্রসঙ্গে প্রথমেই আমাদের মনে পড়ে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কথা। এরপর মাইকেল মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে বুদ্ধদেব বসু, মনোজ মিত্র, নৃসিংপ্রসাদ ভাদুড়ী প্রমূখ আরো অনেক বিদ্বজ্জনেরা সাহিত্যের বিবিধ ধারায় মহাভারতের চিন্তাশীল ব্যাখা দিয়েছেন, কখনও পুরাণের নবনির্মাণ করেছেন। এখানেই সবার থেকে স্বতন্ত্র হলেন কথাসাহিত্যিক দীপক চন্দ্র। দীপক চন্দ্রের পরিচয় দিতে গিয়ে বলা যায়, প্রাচীন ভারতীয় মিথলোজি বিশেষ করে মহাকাব্য, পুরাণ নিয়ে তাঁর কথাসাহিত্যচর্চা সাহিত্য রচনার সুবিশাল প্রেক্ষাপটে একটি নতুন ঘরানার উদ্বোধন ঘটিয়েছে *পৌরাণিক উপন্যাস* নামে।[৩] মহাভারতের অতিপরিচিত চরিত্র ও ঘটনাবলীকে, এমনকি চোখের আড়ালে থেকে যাওয়া অজানা সব বিষয় গুলিকে এক এক করে তুলে ধরে যে যুক্তিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় এদের নবনির্মাণ ঘটালেন, তা পাঠককে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করে যে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলি আদতে এভাবেই ঘটেছিল কিনা। দীপক চন্দ্রের সাহিত্যে সেই নিহিত বা অর্ধ সত্যের যেভাবে খোলাসা করবার প্রয়াস লক্ষিত হয়, সুচারু বিন্যস্ততার গুণে তা যথার্থ অর্থেই সৃজনশীল হয়ে উঠেছে। নিঃসন্দেহে তিনি বাংলা সাহিত্যের পরিবারে একটি নতুন ধারা সংযোজন করেছেন। তাঁর মিথকেন্দ্রিক সাহিত্য রচনার ভিত্তিভূমি হল সুস্থ, সুন্দর, ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি অপার অনুরাগের প্রকাশ। এ কারণে দীপক চন্দ্রের সাহিত্যজীবনের কথা উচ্চারিত হলে তাঁকে একটি বিশেষ নামে স্মরণ করা হয় – *মাইথোনভেলিস্ট দীপক চন্দ্র।*

মহাভারতের চরিত্রদের নিয়ে কথা বলতে গেলে নারী চরিত্রদের কোনোদিক থেকে পিছিয়ে রাখা সম্ভব নয়। বরং দেখা যায়, মহাকাব্যটির নারীরা অনেকেই কূটধর্ম ও রণকৌশলে পারঙ্গম ছিল। দ্রৌপদীর মতো কেউ প্রতিশোধ নিতে না জন্মালেও মহাভারতের জটিল রাজনীতির আবহ বেশির ভাগ নারী চরিত্রকেই পর্দার আড়াল থেকে বের করে এনেছে। দাঁড় করিয়েছে ভারতরাজনীতির রঙ্গমঞ্চে। রাজনীতির সেই চালে

কেউ সেখানে রাণী, কেউ বা সেখানে সামান্য বোড়ে। কিন্তু প্রত্যেকেই নিজ নিজ জায়গায় অদ্বিতীয়। তারা সেখানে না থাকলে মহাভারত এভাবে তৈরী হত কিনা সন্দেহ। সেই নারী চরিত্রদের সারিতে *গান্ধারী* নামটি অতি প্রাসঙ্গিক। অথচ সে মহাভারতের ঝা চকচকে চরিত্র যেমন নয়, আবার তাঁকে অপাংক্তেয় করে রাখাও চলে না। চরিত্রটিকে দিয়ে যেন *কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব* মহাভারত রচনার ছককে করেছেন পরিচালিত। গান্ধারীর মত একজন ধর্মপরায়ণা নারী না থাকলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বাস্তবিকই হতো কিনা সংশয় থেকে যায়। যুক্তিবাদী ঔপন্যাসিক দীপক চন্দ্র মহাভারতের গান্ধারীর চোখের বাধন খুলে নির্মাণ করলেন এক অচেনা গান্ধারীর। উপন্যাসের নাম দিলেন *গান্ধারী, কুরুক্ষেত্রের গান্ধারী*।[৪] উপন্যাস আধুনিক জীবনের মহাকাব্য। উপন্যাসের অবয়বে তাঁর চরিত্ররা নিজেদের আঁতের কথা বলে থাকে। দীপক চন্দ্র সেই উপন্যাসের আঙ্গিকেই এখানে পৌরাণিক সেই নারীটির অজ্ঞাত মনের গভীরে প্রবেশ করেছেন। পরিণামে বের হয়ে এসেছে মহাকাব্যের ধূলিধূসরে চাপা পড়ে যাওয়া রক্তমাংসের গান্ধারী। মহাভারতের দ্বিতীয় সত্য যুক্তিবুদ্ধির খেলায় আত্মপ্রকাশ করল। ধর্মযুদ্ধ নামে খ্যাত কুরু পাণ্ডবের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে যে অন্যায় অধর্মগুলি হয়েছিল, তা নতুন দৃষ্টিকোণে বর্ণিত হলো উপন্যাসের কথকতায়। এভাবেই গান্ধারী নতুন করে ভাববার অবকাশ রেখে দীপক চন্দ্রের লেখনীতে আত্মপ্রকাশ করল আধুনিক পাঠকের সামনে।

মূল বিষয়ে প্রবেশের পূর্বে প্রথমেই মনে প্রশ্ন জাগে মহাভারতীয় নারীচরিত্র কুরুমাতা গান্ধারীর নাম নিয়ে। আমরা জানি, সে মহাভারতের প্রধান নারী নয় বরং বলা ভালো ভাগ্যবিড়ম্বিত একটি অসহায় চরিত্র। এই নারী চরিত্রটি মহাকবির নির্দিষ্ট কাহিনী পরিচালনার আধার। অথচ সমগ্র মহাভারতে কুরুকুলের এই জ্যেষ্ঠা বধূর নিজস্ব কোনও নামের উল্লেখ নেই; দেশের নামে, জাতির নামেই তাঁর পরিচয়। আলাদা করে নাম রাখবার কোনও প্রয়োজন বোধ করেন নি মহাকবি। সে মহাভারতের *ক্ষত্রবধূ*।[৫] তাঁর অনুপস্থিতিতে মহাকাব্যের বিশেষ ক্ষতি হত না। আবার উপস্থিতিতেও চরিত্রটির কোনও গুরুত্ব বাড়েনি। কেবল পরিকল্পিত কয়েকটি উদ্দেশ্য তাঁকে দিয়ে করিয়ে নেওয়া হয়েছে। দীপক চন্দ্রের মতে, নির্দিষ্ট পরিধির ভেতর তাঁর যাবতীয় গতিবিধি। ধর্ম নামক রঙিন আদর্শের মোড়কে মুড়ে দেওয়া হয়েছে মাত্র। তবুও বলা যায়, তাঁর মত একজন একান্তবাসীনি নারী, কৌরবদের অসহায় এই জননী না থাকলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হতো কিনা সন্দেহ। দীপক চন্দ্র গান্ধারীকে নিয়ে রচনায় অদেখা নারী হৃদয়ে প্রবেশ করে নতুন সত্য আবিষ্কার করেছেন। ধর্মযুদ্ধ নামে খ্যাত কুরু পাণ্ডবের মধ্যেকার কুরুক্ষেত্রে আঠারো দিন ব্যাপী ভয়ানক সংঘর্ষ যে অন্যায় অধর্মের যুদ্ধ ছিল, লেখক তা তুলে ধরেছেন ভাগ্যবিড়ম্বিত এবং রাজনীতির যূপকাষ্ঠে বলিপ্রদত্ত এই নারীটির মধ্য দিয়ে।

গান্ধারদেশের[৬] রাজকন্যা গান্ধারী[৭] ও হস্তিনাপুরের যুবরাজ ধৃতরাষ্ট্রের[৮] বিয়েটা সৌজন্য ও ভালোবাসার নিদর্শন হিসেবে দেখানো হলেও এটা জলের মতো পরিষ্কার, রাজকন্যাই হোক অথবা সাধারণ নারী, স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কেউই অন্ধ ছেলেকে বিয়ে করতে আগ্রহী হতে পারে না। রূপকথার গল্পে এরকম ফ্যান্টাসি বা খামখেয়ালি ভাব যে আবেগ নিয়ে আসে, বাস্তবজীবনে তাঁর মুখোমুখি হওয়া ততোধিক বিড়ম্বনার। বাস্তবে রাজকুমারী গান্ধারী তৎকালীন ভারতের জোট রাজনীতিতে রাজনৈতিক ঘুঁটি ছাড়া আর কিছু ছিল না।[৯] সে ছিল মহাকবির হাতের পুতুল। তাঁর সমস্ত আচরণ কৃত্রিম, মেপে দেওয়া।

অন্ধের সাথে প্রায় জোর করে দেওয়া বিয়েতে গান্ধার রাজ্যের সায় না থাকলেও রাজনীতিগত দুর্বল অবস্থানের কারণে মেনে নিতেই হয়েছিল। কিন্তু গান্ধাররাজ সুবলের পুত্র যুবরাজ শকুনি বোনের অপমান মানতে না পেরে এর প্রতিশোধ নেবার জন্যে নিজেও হস্তিনাপুরে চলে আসেন। পাণ্ডু পুত্রদের অধিকার খর্ব করে নিজের বোনের ছেলে দুর্যোধনকে রাজপদে অভিষিক্ত করতে যা করা দরকার সমস্ত পদক্ষেপ নিয়েছিলেন শকুনি। কিন্তু শেষ রক্ষা হয় না। মহাভারতে কুরুক্ষেত্রের বিরাট রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে অধর্মী দুর্যোধনের মৃত্যু ও কৃষ্ণের চতুর ছলনায় পাণ্ডবদের বিজয়কে ধর্মের জয় বলে ঘোষণা করা হয়েছিল।

ঠিক এখানেই দীপক চন্দ্র উল্টোপথে হেঁটেছেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ যে চূড়ান্ত অন্যায় যুদ্ধে পরিণত হয়েছিল, তা তিনি তাঁর বিভিন্ন মহাভারত সংক্রান্ত লেখায় ঘটনা ধরে বিশ্লেষণ সহকারে ব্যাখ্যা করেছেন। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে মহাভারতের পুরো ঘটনাকে উপলব্ধি করেই তিনি একটি নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, সাথে কুরু-পাণ্ডবের নানান চরিত্রকে ধরে ধরে ভেঙেছেন ও গড়েছেন এবং সবশেষে অর্জিত উপলব্ধি ও বিশ্লেষণকে কথাসাহিত্যে নিজস্ব শৈলীতে পরিবেশন করেছেন। যখন যে চরিত্রের বিশ্লেষণে নেমেছেন, তখন তার মনের অতল অন্ধকারে তলিয়ে গিয়ে কার্যকারণ সম্পর্ক খুঁজেছেন। সাহিত্যিক নিজের চিন্তাধারার ওপর থেকে নিজেই পর্দা সরিয়েছেন,

> বলাবাহুল্য, ইতিহাস সৃষ্টি আমার নয়। সে চেষ্টাও করিনি।তবে মহাকাব্যের আখ্যানগুলিকে নিজের প্রয়োজনে গ্রহণ-বর্জন করেছি। অলৌকিক কাহিনী হয় বর্জিত হয়েছে, না হলে তার বাস্তব ও যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, পৌরাণিক ঘটনাগুলিকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য আধুনিক মানুষের চিন্তা, রুচি ও মেজাজের ওপর গুরুত্ব অর্পণ করেছি। পুরাণের পৌরাণিকতাটুকু রেখে আজগুবি অসম্ভব ঘটনার ভার হালকা করেছি।[১০]

মানব মনের গতিপথ বড় জটিল। হাজারো বিচিত্র মানসিকতার ভিড়ে লুকিয়ে থাকা অবচেতন স্তরের অব্যক্ত কথা গুলোকে, অজান্তে চলে আসা ভাবনা গুলোকে দীপক চন্দ্র একজন সাইকো-অ্যানালিস্টের মত করে সেগুলোর তত্ত্বানুসন্ধান করেছেন। মনন-বিশ্লেষণের আধুনিক যুক্তিবাদী বিবেচনা তাঁকে মহাভারতের প্রচলিত ভাবধারায় পথ হারাতে দেয়নি, নৈর্ব্যক্তিক ও পক্ষপাতশূন্য দৃষ্টিতে প্রত্যেক ঘটনা তথা চরিত্রের সম্যক আলোচনা করেছেন।

রচনার শুরুতেই নজরে পড়ে লেখকের নামকরণ। একটি চরিত্রের জীবনের দুটি দিক, দুই সত্তার স্বরূপ সন্ধান করেছেন — *গান্ধারী* এবং *কুরুক্ষেত্রের গান্ধারী* নামের মধ্যে।[১১] লেখক বলেছেন, ইংরাজীতে যাকে বলে SUFFERING CHARACTER গান্ধারী হল তাই। একদিকে রাজকন্যা গান্ধারীর রাণী হয়ে মা রূপে উত্তরণ, নিজের পরিবার ও সন্তান সম্পর্কে যাঁর সচেতনরূপের প্রকাশ কম; অন্যদিকে সেই সচেতন রূপের আত্মপ্রকাশ ঘটে কুরুক্ষত্রের ভয়ানক যুদ্ধের মর্মান্তিক রক্তক্ষয়ী ফলাফল দেখবার পর। সেখানে সে যেন তাঁর কর্মফল ভোগ করছে। গান্ধারীর নির্মোক সত্তাকে টেনে বার করে এনেছেন দীপক চন্দ্র,

> ধর্ম, সত্য, আদর্শের রঙিন ক্যাপসুলটি রোগ প্রতিষেধক বটিকার মতোই আমাদের কাছে লোভনীয়। কখনও ক্যাপসুলের আবরণ খুলে দেখিনা তার ভেতর কী আছে? 'স্ত্রী পর্বে' কুরুক্ষেত্রের মহাশ্মশানে দাঁড়িয়ে গান্ধারী প্রথম পুতুলের সাজ খুলে

> দাঁড়াল। রক্ত-মাংসের মানুষের হৃৎস্পন্দনের ধুক্‌পুক্‌,ধুক্‌পুক্‌ শব্দ প্রথম শুনলাম তার বুকে। মানবী গান্ধারীর সাথে দেখা হল কুরুক্ষেত্রে।[১২]

লেখকের কাহিনীর শুরু এক প্রাক সান্ধ্যমুহূর্তে গান্ধারীর গুনগুন করে গানের মধ্য দিয়ে। সরল মনটা তাঁর তখনও রাজনীতির চাকায় পিষ্ট হয়ে যায় নি দেখাতেই দীপক চন্দ্রের এই পটভূমি নির্মাণ। ঘটনা অন্যদিকে বাঁক নেয় হস্তিনাপুরের রাজনীতি সমাবেশ থেকে শকুনির ফেরবার পর।[১৩] গান্ধারী শকুনির ইতস্ততভাব দেখে বুঝতে পারে কিছু একটা হতে চলেছে। একটি দুর্বল দেশের রাজকন্যাদের বোধ হয় এভাবেই সদা প্রস্তুত থাকতে হয়। সব দেশের রাজকন্যাদেরই বিয়েটা হয়ে থাকতো রাজা এবং রাজ্যের স্বার্থে। রাজকুমারীরদের ইচ্ছা অনিচ্ছা, ভালোলাগা মন্দলাগার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। নারীদের জীবন যেন বরাবরই ভাগ্যের অধীন, জীবন রঙ্গমঞ্চে তার ভূমিকা খুবই যৎসামান্য। আর এভাবেই দীপক চন্দ্র রাজনীতির পায়ের তলে একটি নারীর গুড়িয়ে যাবার ইতিবৃত্ত বলতে শুরু করলেন।

লক্ষণীয়, দেশের জন্যে নিজের আদরের প্রিয় ছোট বোনকে এক অন্ধ যুবরাজের হাতে সমর্পণ করে আসতে হবে, এই অসম্মান ও অপমান শকুনিকে যন্ত্রণায় মথিত করে তুলেছিল। এর অন্যথা হলে দুর্বল গান্ধারের ওপর নেমে আসতে পারে হস্তিনার মতো সাম্রাজ্যশালী দেশের নির্মম আঘাত। গান্ধারী নিজের ভয় ও উৎকণ্ঠাকে বুকে চেপে ধরে একটা জিনিস অন্তর দিয়ে অনুভব করেছিল, রাজনীতির আবর্তে নারীর জীবন পণ্য। বাহ্যিক কষ্ট ও মর্মযন্ত্রণার কোন স্থান নেই সেখানে। মহাভারতের গান্ধারীর মনে নানা দ্বিধা ছিল। দীপক চন্দ্রের গান্ধারী কিন্তু আত্মসচেতন। জীবনের অব্যক্ত কথা অনুভব করবার মত একটি সচেতন প্রাণ ছিল তাঁর। এমনকি নারী স্বাধীনতার প্রশ্নটিও মনে এসেছে তাঁর। সে বুঝতে পেরেছে তাঁর সাথেও এরকম কিছু ঘটতে চলেছে। লেখকের কলমে এক নারীর মনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব স্পষ্ট ধরা পড়েছে এখানে। রাজকন্যা বলেই যত দুর্ভাবনা তাঁর। এ তো অতি প্রাচীন দস্তুর। পুরুষেরা নারীকে নিয়ে রাজনীতির জুয়া খেলে। সেখানে মেয়েদের কোনও সম্মান নেই। পুরুষের জুলুম, অপমানকে তাদের শুধু বরণ করে নিতে হয়। রাজ্যনীতিতে এটাই ছিল নারীর ভাগ্যলিপি। তাই তাঁর কন্ঠে শোনা যায়,

> আমি এমন কোনও মন্দ কপাল করে আসিনি যে তার জন্যে কোনও শঙ্কা থাকতে পারে। তবে রাজকন্যা বলেই দুর্ভাবনা। কারণ, রাজনীতির ঘোলা আবর্তে তোমরা ঘরের মেয়েকে টেনে আনতে কুণ্ঠা করোনা। ... এ তো পুরান খেলা।[১৪]

গান্ধারী পরিষ্কার দেখেছে শকুনির নত চোখ, অনুভব করেছে পিতা সুবলের অপারগ অবস্থার প্রকৃত কারণ। দীপক চন্দ্র মহাভারতের নবনির্মাণে দেখিয়েছেন, ভারতবর্ষে তখন জোটধর্মী রাজত্বের প্রসার বাড়ছিল। বেশীরভাগ রাজা ও রাজন্যবর্গেরা একত্রিত হয়ে একটা শক্তিজোট তৈরী করছিল যার নেতৃত্ব দিচ্ছিল মগধ ও হস্তিনাপুর। একমাত্র যাদব সমবায় রাজ্যগুলি এই জোট নেতৃত্বের বাইরে ছিল এবং তারা এর বিরোধিতাও করে চলেছিল। কিন্তু গান্ধার রাজ্যের মতো ক্ষুদ্র রাজ্যের পক্ষে এতবড় রাষ্ট্রজোটের বিরোধিতা করা সম্ভব ছিল না; বিশেষ করে হস্তিনাপুরের রাজ্যভার যখন ভীষ্মের মত একজন কড়া প্রশাসকের হাতে রয়েছে যে নিজের কাজ আদায় করে নিতে জানে। ফলে সবলের কাছে দুর্বলের নতিস্বীকার করা ছাড়া আর কোনও উপায় থাকে না। কাশীর স্বয়ম্বরসভা থেকে ভীষ্ম যেমন কাশী রাজকন্যাদের[১৫] তুলে এনেছিলেন, তেমনি গান্ধারীকে শক্তিবলে তুলে নিয়ে যাবার জন্য গান্ধার আক্রমণ

করা তাঁর পক্ষে কোনও বিশেষ ব্যাপার হবেনা। ফলে মনে প্রচণ্ড বিরোধ জন্মানো স্বাভাবিক, অথচ গান্ধারীর তা স্বভাববিরুদ্ধ। নারীর জীবন তাঁকে শিখিয়েছে ধৈর্যশীলতা - সকলকে সুখে শান্তিতে রাখা নারীর প্রথম ধর্ম। ভালবাসা, যত্ন, সেবা দিয়েই তাঁকে সমস্ত প্রতিকূলতা জয় করতে হবে। এই শিক্ষায় বড় হয়ে ওঠা গান্ধারী তাই সহনশীলতার প্রতিমূর্তি। এখানেই সে কুন্তী, দ্রৌপদী থেকে স্বতন্ত্র। কুন্তী বা দ্রৌপদীর মতো নিজের অধিকার নিয়ে লড়াই করবার জেদ গান্ধারীর মধ্যে কখনোই দেখা যায় নি। মহাকবির বর্ণনে সে বরাবরই নির্লিপ্ত। তাঁর এই নির্লিপ্ততা থেকেই দীপক চন্দ্র বুঝেছেন, গান্ধারীর কিছুই করার ছিল না। রাজনীতির মঞ্চে সে বলিপ্রদত্ত; তাঁর হয়তো প্রাণ আছে, কিন্তু প্রাণের কোনও সাড়া নেই। তাঁর জীবন ধর্ম তো আছে, কিন্তু বলবার স্বাধীনতা নেই। এই অসহায়তাকে ধর্মপ্রাণতার নাম দিয়ে মহাকবি গান্ধারীকে তাঁর নিজের ছেলেদের দিক থেকেই মুখ ফিরিয়ে রেখেছিলেন। অথচ এই ধর্মের বেড়াজালে আবদ্ধ গান্ধারীকে ছোট ছোট ঈর্ষা জ্বালায় ক্ষতবিক্ষত হতেও দেখা যায়। হাত পা বাধা থাকলেও সে তো একজন মানুষ, একজন মা। দীপক চন্দ্র প্রাণহীন গান্ধারীকে প্রেমে ঈর্ষায় সঞ্জীবিত করলেন, তাঁর প্রকৃত স্বরূপ ধরা পড়ে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর।

মহাভারতের নিষ্প্রাণ গান্ধারীকে লেখক প্রাণসর্বস্ব নারীতে পরিণত করেছেন বলেই চিরচেনা গান্ধারীর কার্যকারণের ধারাবাহিকতা, নারীজাত প্রবৃত্তির সন্ধান করতে হয়। মহাভারতে এতটা সময় তাঁর জন্যে ব্যয় করা হয় নি। সংসারজীবনে তাঁর প্রবেশ ঘটেছে অপমানের মধ্য দিয়ে। তবুও সে নিজ গুণে অপমানকে ভুলে কুরুপরিবারের বধূ হয়ে উঠতে দ্বিধায় আটকে থাকেনি। এর পেছনে তাঁর সেই নিরীহ ধার্মিক মানসিকতাই কাজ করেছে। যে ভীষ্মের জন্য তাঁর জীবনের মসৃণতাই হারিয়ে গিয়েছে, সেই ভীষ্মকেও ক্ষমাশীল দৃষ্টিতে দেখেছে সে। অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকেও স্বামীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা দিতে কার্পণ্য করেনি। দীপক চন্দ্র গান্ধারীকে মহাভারতীয় সত্তা থেকে সরিয়ে আনেন নি। বরং এর ভেতর দিয়েই তাঁর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করতে সচেষ্ট হয়েছেন।

উল্লেখ্য, ব্যাসদেব পুরোটা কাব্যে গান্ধারীর চোখে কাপড় দিয়ে রেখেছেন। একে তিনি পাতিব্রত্যের এক চূড়ান্ত নিদর্শন বলে তুলে ধরেছেন; অথচ একটু মানবিক দৃষ্টি দিয়ে দেখলে বোঝা যায় তা কতটা মর্মান্তিক ও অমানবিক। অপরচিকে, এরকম গল্প বিশ্বাসযোগ্যতা ও স্বাভাবিকতার উর্দ্ধে বলেই মনে হয়। দীপক চন্দ্র এই নিঃসঙ্গ নির্যাতনের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছেন নারীচরিত্রটিকে। অতিনাটকীয়তাকে বর্জন করে মানবিকতার স্তরে নামিয়ে আনা হয়েছে। চোখ তখনই আবদ্ধ হয়েছে যখন সে স্বামী সংলগ্না। এর পেছনে লেখক একটি চূড়ান্ত বাস্তব মানসিকতা তুলে ধরেছেন। দেখিয়েছেন, পারস্পরিক শ্রদ্ধা-ভালোবাসা টিকিয়ে রাখবার জন্যই গান্ধারী এরকম সিদ্ধান্ত নিয়েছে। করুণার স্পর্শে দাম্পত্যপ্রেম মলীন হতে দেয় নি দীপক চন্দ্রের গান্ধারী। কিন্তু কিছু সময় তাঁর অন্ধত্ব যেমন সমাজের বিরুদ্ধে এক নারীর প্রতিবাদ ঘোষণা করেছে,[১৬] তেমনি আবার কিছু সময় এই অন্ধত্বই চারিত্রিক দোটানার রূপক হয়ে উঠেছে। ধর্মপরায়ণতার আচ্ছাদনে ঢাকা, সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে দ্বিধায় জীর্ণ হওয়া, সময়মত উপযুক্ত কথা বলতে না পারা সত্তাটি এই আবরণেই প্রকাশ পেয়েছে। অন্যদিকে দীপক চন্দ্রের ভাবনায় পাণ্ডুপত্নী মাদ্রীর কাছে গান্ধারীর চোখ বদ্ধ রাখবার পেছনের কারণ, ভীষ্মের মুখ দর্শন যেন করতে না হয়। কেননা তাঁর সারাজীবনের বন্দীদশার জন্যে এই একটি মাত্র পুরুষই দায়ী।[১৭]

লক্ষণীয়, একটি রাজ পরিবারের ভেতরে কত ধরণের মানুষ হতে পারে, একে একে আবিষ্কার করেছে গান্ধারী। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর কাছে পারিবারিক অন্তঃকলহের রূপটা পরিষ্কার ধরা পড়েছে। রাজসিংহাসনের দাবী নিয়ে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর মধ্যে যে চাপানউতোর শুরু হয়েছিল, তা গান্ধারীকেও অনেকটা পরিবর্তন করে দেয়। অন্ধ স্বামীর রাজা হওয়ার উগ্র বাসনা অনিচ্ছাস্বত্বেও তাঁকে রাজনীতির জঙ্গলে টেনে নিয়ে আসে। পরিবারের রাজনৈতিক ইতিহাস আদি থেকে অন্ত স্পষ্ট দেখতে পারে গান্ধারী। দুই ভাইয়ের মধ্যেকার লড়াইয়ের সূচনা অনেক আগে হয়েছিল যখন ধীবরকন্যা সত্যবতী রাজা শান্তনুর জীবনে প্রবেশ করেছিলেন। দীপক চন্দ্রের নবনির্মাণে দেখা যায়, মূল অন্তর্দ্বন্দ্বটা আসলে সত্যবতী পুত্র দ্বৈপায়ন ও শান্তনু পুত্র ভীষ্মের মধ্যে।[১৮] উভয়েই অনার্য নারীর গর্ভে জন্মালেও ভীষ্মের পিতা শান্তনু রক্তে কুরুবংশেরই বাহক, অন্যদিকে দ্বৈপায়নের পিতা পরাশর মুনি, যার আগে পড়ে ক্ষত্রিয়রক্তের কোনও নামনিশানা নেই। কিন্তু সত্যবতীর মাধ্যমে দ্বৈপায়নের কুরুবংশে মাথা গলানো ভীষ্ম কোনোদিনই অন্তর থেকে মেনে নেন নি। উভয়ের মধ্যেকার আলগা সম্পর্ক গান্ধারী চোখে না দেখলেও অনুভব করতে পারত। আর তাদের এই একে অপরকে টেক্কা দেবার লড়াইয়ে আজ পুরো পরিবার জড়িয়ে গেছে। এ যেন জঙ্গলের জায়গা। রাজনৈতিক কর্তৃত্ব, আধিপত্য, অধিকারবোধ মানুষের সম্পর্ককে কিভাবে নোংরা করে দেয়, গান্ধারীর উপলব্ধিতে তা জলজ্যান্ত ধরা পড়েছে।

তাই, পাণ্ডুকে যখন ধৃতরাষ্ট্র রাজ্যচ্যুত করে শতশৃঙ্গ পর্বতে পাঠানোর ব্যবস্থা করে, তখন গান্ধারীর ভেতর থেকে হতাশাজনিত দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তাঁকে যথার্থই আভাস দিয়েছিল রাজত্ব নিয়ে যে জল ঘোলা চলছে, এর পরিণাম সুখকর হবে না। এর পরপরই যখন কুন্তীর পুত্রসন্তান প্রসবের কথা কানে আসে, গান্ধারীর দীর্ঘশ্বাস হাহাকারে পরিণত হয়ে, সে ঈর্ষাকাতর হয়ে ওঠে। কেননা বংশের জ্যেষ্ঠপুত্র হিসেবে কুন্তীর সন্তান যুধিষ্ঠিরই সিংহাসনে বসবার যোগ্য উত্তরাধিকারীর মর্যাদা ছিনিয়ে নেয়। অথচ পাণ্ডুর শারীরিক অক্ষমতা সকলেরই জানা। পাণ্ডুর পরামর্শেই কুন্তীর ক্ষেত্রজ সন্তানকামনা গান্ধারীকে অস্থির করে তোলে। গান্ধারী তাঁর নারীজাত ইন্দ্রিয় দিয়ে উপলব্ধি করেছিল কুন্তী সহজে ছেড়ে দেবার পাত্রী নয়; পাণ্ডুর নির্বাসনের অপমান সে কিছুতেই ভুলে যাবে না, পাণ্ডুকেও ভুলতে দেবে না। এখানেই দুটি চরিত্রের মধ্যে আকাশপাতাল পার্থক্য করে দেখিয়েছেন ঔপন্যাসিক। গান্ধারীর মধ্যে ন্যায়ের প্রতি, সততার প্রতি দুর্বলতা অনেক ক্ষেত্রেই তাঁকে নিষ্ক্রিয় করে রেখেছে। অন্যদিকে, কুন্তী নিজের ভাগ্যের সাথে দরকারে লড়াই করেছে; তা সে যতই অধর্মের পথ হোক না কেন, নিজের অভীপ্স বস্তুকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছে অন্যের অধিকার থেকে। পঞ্চপাণ্ডবদের জন্মসংক্রান্ত কাহিনীতে দীপক চন্দ্র যে নতুন দৃষ্টিকোণের পরিচয় দেন, তা অভিনব। লেখকের নজরে পাণ্ডবেরা সকলেই বিদুরের ঔরসজাত সন্তান। দুর্বাসার দেওয়া অভিকর্ষণ মন্ত্রকে কাজে লাগিয়ে কুন্তী, বিদুর, সর্বোপরি ব্যাসদেবের এই পরিকল্পনা।[১৯] লেখক দেখান, যুধিষ্ঠির যে কুন্তী ও বিদুরের অবৈধ প্রণয়ের সন্তান, এঘটনা গান্ধারীর নারীদৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। দেবর বিদুরের ব্যবহারের তারতম্য তাঁর এই ধারণাকে আরও বদ্ধমূল করে। রীতিমত ষড়যন্ত্র করে রাজনৈতিক প্রতিশোধের জন্য যে এক বিস্তৃত প্রেক্ষাপট প্রস্তুত করা হচ্ছে, সেই বিষয়ে স্বামীকে সাবধান করে গান্ধারী বলেছে,

> স্বামী, মেয়েমানুষ বলে অবহেলা কর না, শ্রদ্ধা কর। মনে রেখ, মেয়েদের একটা অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় আছে। আগে থেকে সে বিপদ টের পায়। আমার সমস্ত অনুভূতি

> দিয়ে অনুভব করতে পারছি একটা ঝড় আসছে। শতশৃঙ্গ পর্বতের চূড়ায় তা কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। একদিন হস্তিনাপুরের ওপর আছড়ে পড়বে।[২০]

এর অনতিকাল পরেই দুর্যোধনের জন্ম, এবং বড় অদ্ভুত ভাবে তাঁর জন্মের সময়টা খারাপ বলে দুর্যোধনকে পাপাত্মা বলে রটিয়ে দেওয়া হল। এমনকী তাঁকে মেরে ফেলবার কথাও উঠে এল। নিঃসন্দেহে এ এক ভয়ানক ষড়যন্ত্র। অথচ এরকমই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় একদিন কৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল। কৃষ্ণের জন্মকে নিয়ে তো এই ধরনের অপবাদ রটানো হয় নি। এই প্রশ্নের কোনও উত্তর গান্ধারী পায় না। আসলে এ ছিল যুধিষ্ঠিরের রাজত্ব দাবির অধিকারকে বলবৎ করবার এক গভীর ষড়যন্ত্রের পথ। ঔপন্যাসিকের বিশ্লেষণে স্বয়ং ব্যাসদেব এই চক্রান্তের মূল পাণ্ডা। অথচ প্রকৃত হিসেব করলে দেখা যাবে, পাণ্ডবেরা আসলে কুরুবংশেরই কেউ নয়। বিদুরের পিতা দ্বৈপায়ন ও মাতা শূদ্রাণী এক দাসী। ফলতঃ বিদুরের শরীরে কোনভাবেই পুরুবংশীয় রক্ত বইছে না। অবশ্যই ব্যাসদেব *বন্ধুদায়াদ* হবার জন্যে মহাভারতীয় নিয়ম অনুযায়ী বিদুর কুরুবংশের সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার আশা করতেই পারে, কিন্তু কোনভাবেই সে কুরুবংশের রক্তধারার শরিক হতে পারবে না।[২১] যেহেতু এই মহাকাব্য স্বয়ং বেদব্যাসেরই লেখা, সে তো জন্মসূত্রেই অনার্য এবং সত্যবতীর পরিচয়েই মহাভারতে তাঁর আগমন। সেই মহাভারতের শেষে দেখা গেল যে, কোন শুদ্ধ আর্যরক্ত আর রইলনা। দীপক চন্দ্র একদিন পরাশর মুনির যে প্রতিশোধের কাহিনি শুনিয়েছিলেন,[২২] তার সমাপ্তি ঘটেছিল কুরুবংশের ধ্বংসে।

মূল প্রসঙ্গে ফেরা যাক, যতই ধৃতরাষ্ট্র শতশৃঙ্গপর্বতে পাণ্ডুকে নির্বাসন দিক না কেন, পাণ্ডুর আচমকা মৃত্যুই কুন্তীর হস্তিনাপুরে ফেরাবার পথটাকে সহজ করে দিয়েছিল। গান্ধারী কোমল হৃদয়ের নারী। অন্যের শোকে সে শোকসন্তপ্তা। কুন্তীর দৈন্য দশা দেখে তাঁর মন গলে গেল। নিজ চরিত্র গুণে গান্ধারী তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়াল ও তাঁর সন্তানেরা কৌন্তেয়দের ভ্রাতৃস্নেহে আপন করে নিল। কিন্তু রাতের সব তারাই ছিল দিনের আলোর গভীরে। তাঁর মনের অসাবধানতার ফাঁকে কুন্তী যে গান্ধারীর জীবনটা রাহুর মত গ্রাস করে নিতে পারে, এই বোধটা গান্ধারীর উপলব্ধির স্তরে পৌঁছতে অনেকটা দেরি হয়ে গেল। সে তাঁর স্বামীকে বার কয়েক সাবধানও যে করেনি, তা নয়। কিন্তু রাজনীতিতে তাঁর মতো নারীর চিন্তাকে মূল্য দেবার সময় কারো নেই। মহাভারতের গান্ধারী এতটাও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ছিল কিনা সন্দেহ। কিন্তু দীপক চন্দ্রের এই নারী যতই নরমস্বাভাবা হোক না কেন, মানুষকে চেনবার চোখটা তাঁর বর্তমান ছিল। একদিন যেভাবে সে ভীষ্ম ও দ্বৈপায়নের আসল চেহারাটা চিনতে পেরে গিয়েছিল, তেমনি কুন্তীর চরিত্রের জটিল ও অস্পষ্ট দিকগুলো গান্ধারী মানসনেত্রে ধরা পড়ল। কৌন্তেয়রা দেবতাদের সন্তান – এই কথা প্রচারের পেছনে বিদুরের যে অন্য মতলব আছে, তা গান্ধারী আগেই আন্দাজ করে নেয়। যৌনব্যাভিচারকে ঢাকবার এ এক দুর্দান্ত এক কৌশল। অথচ চরিত্রটির অন্তর্দ্বন্দ্ব এরকমই যে সবকিছু বোঝার পরেও গান্ধারী কেমন যেন নির্লিপ্ত থাকতে চায়। এগিয়ে এসে নিজের ঘর সামলাতে সে লেগে পড়ে না। প্রতি মুহূর্তে একটা পরস্পরবিরোধী মানসিকতা কাজ করেছে গান্ধারীর মধ্যে। ভালোবাসা ও ঘৃণার দোলাচলতায় দুলেছে। কুন্তীর মত করে একবারও তাঁর মধ্যে survival of the fittest এর তাগিদ লক্ষ করা যায় না। এতই উদার মনের নারী গান্ধারী, যে নিজের সন্তানদের পাশাপাশি কৌন্তেয়দেরকেও বুকে টেনে নিয়েছিল। কিন্তু যে স্নেহতে পাণ্ডবেরা আপ্লুত, সেই ভালবাসাই আবার তাঁর পুত্ররা পায়নি নিজের মায়ের কাছে। গান্ধারীর ভালোবাসার

এই বৈপরীত্য সত্যি অবাক করে দেয়। আসলে এই নারীর মানসতা প্রকৃত অর্থেই বিরাট রাজনীতির শিকার। কখনও দেশের রাজনীতির বলি হতে হয়েছে, কখনও পরিবারের। কিন্তু রাজনীতি গান্ধারীর যে মূল সত্তাটিকে পাল্টাতে পারে নি, সেটা হল উন্নত মনুষ্যত্ববোধ। তাই এক কথায় গান্ধারীর প্রকাশ সম্ভব নয়, তাঁকে তাঁর আচরণের মধ্য দিয়েই চিনে নিতে হবে।

বাস্তবে যে ন্যায়ধর্মকে গান্ধারী এতদিন সবার ওপরে রেখেছিল, সেই ধর্মই তাঁর হাত-পা বেঁধে দিয়েছিল। সন্তানদের সম্পর্কে নানা কটূ কথা শুনে শুনে তাঁর মনে বিরাগ জন্মেছিল। দীপক চন্দ্রের অনবদ্য কল্পনায় দেখি, এটাও যে রাজনীতির সুক্ষ্ম প্যাঁচ, সাদা মনের গান্ধারী অনুভব করতে পারে নি। তবে ঈর্ষা তাঁর মধ্যেও দানা বেঁধেছে। হতাশার অন্ধকারে সে নিজের জীবনকে তলিয়ে যেতে দেখছিল। পুত্র দুর্যোধন যখন অভিযোগ করে মায়ের কাছে, মাতৃস্নেহ থেকে তারা বঞ্চিত কেন, এর উত্তর গান্ধারী দিতে পারেনি। অথচ যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক তাঁর মনেও অসন্তোষ জমিয়ে তোলে। আবার চালাকি করে যখন দুর্যোধন ও শকুনি পাণ্ডবদের বারণাবতে পাঠাল, সেই ঘটনাও গান্ধারীর মনে অশুভ চিন্তার উদ্রেগ করেছে। আসলে তাঁর তো আর কিছুই করার ছিল না মহাকাব্যকারের হাতে, শুধু চিন্তা করে দগ্ধে দগ্ধে মরে যাওয়া ছাড়া। দীপক চন্দ্র অত্যন্ত বিশ্বস্ততায় ফুটিয়ে তুলে ফেখিয়েছেন, এরকমই হয় সেইসব নারীদের জীবন যারা রাজনীতির যূপকাষ্ঠে বলিপ্রদত্ত।

ঘটনা এরপর দ্রুতবেগে এগিয়েছে। বারণাবতের অগ্নিকাণ্ডে কুন্তীসহ পাণ্ডবদের মৃত্যুর ঘটনা রটে গেলে গান্ধারীর মন যেমন ছেলেদের কর্মকান্ডে বিরক্ত হয়, সাথে সাথে এটাও তাঁর মনে জাগে ব্যাপারটা এত সহজে তো নিপ্‌টে যাবার কথা ছিল না। এখানেই লেখকের গান্ধারী নবনির্মিত হয়ে ওঠে যখন সেও ভাবতে শুরু করে, যারা এত চিন্তা ও পরিকল্পনা করে বিরাট মাপের কৌশল সাজাল, তারা এত তাড়াতাড়ি মরে গেলে তো চলে না। তাই দেখা যায়, পরের বারোটা বছর গান্ধারীই একমাত্র নিশ্চিন্ত হতে পারে নি। কিছু একটা বড় হতে চলেছে, প্রজ্ঞা দিয়ে বুঝতে পেরেছিল সে। পাণ্ডবদের রহস্যময় মৃত্যু তাঁকে কোনভাবেই নিরুদ্বেগ করতে পারে না। শেষপর্যন্ত দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভা গান্ধারীর সমস্ত দ্বিধার অবসান করে দিল। দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক প্রস্তুতি শেষে এবার পাণ্ডবেরা আত্মঃপ্রকাশ করল। গান্ধারীর দূরদৃষ্টি চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থেকেও এর ভয়াবহ অন্তিম পরিণামটা দেখতে পেয়ে যায়।

একই সাথে দ্রৌপদীর বিয়েটা গান্ধারীকে যথেষ্ট আশ্চর্যও করে। কুন্তী তাঁর পুত্রবধূকে পাঁচ ভাগে ভাগ করে দিয়ে যেন নিজের ব্যভিচারের স্বপক্ষে একটা রাস্তা পরিষ্কার করে রাখল। যদিও গান্ধারীর এ বিষয়ে ভাববার কোনও আবশিক্যতা ছিল না, কিন্তু সে তাঁর মনের গতিপথকে রুদ্ধ করতে পারেনি। আত্মসম্মান সচেতন মানুষের কাছে এই মানসিকতাই কাম্য। কুন্তী তাঁর ছেলেদের উদগ্র কামনার আগুনে যেভাবে একটি মেয়ের কোমল মনের ভালোবাসাকে পুড়িয়ে মারল, সেই মেয়ের জ্বলন্ত মনের হল্কাতেই পুরো পরিবার শেষ হয়ে যাবে - এটা গান্ধারী আঁচ করতে পারে। তাই সে ধৃতরাষ্ট্রকে অনুরোধ করে ইন্দ্রপ্রস্থে তাদের আলাদা বাসস্থানের। কেননা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের অপমান দুর্যোধন, কর্ণ, শকুনি এরা কেউ ভোলেনি। এরপর ইন্দ্রপ্রস্থে পাণ্ডবদের রাজসূয় যজ্ঞে গিয়ে কৌরবেরা অপমানিত হয়ে ফিরে এল। এর প্রতিশোধ গ্রহণের ষড়যন্ত্র করা হল শান্তিগৃহের পাশাখেলায়। সব হারানো পাণ্ডবদের সামনে বসিয়ে রেখে

দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের নামে যেভাবে শ্লীলতাহানি করা হল, তাতে নিজের ছেলেদের সম্পর্কে গান্ধারীর সব গর্ব ধুয়ে মুছে গেল।

লক্ষণীয়, দীপক চন্দ্র এখানে অন্য একটি যুক্তির পথ উন্মোচন করেছেন। তিনি এখানে পাণ্ডবদের আপাত নিরীহতাকে একেবারেই এড়িয়ে যান নি। বরং তিনি দেখিয়েছেন, গান্ধারীকে কিভাবে রাজনীতির হাতিয়ার করে তাঁকে দিয়েই তাঁর ছেলেদের সম্মান ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়া হল। গান্ধারী নিজের পুত্রদের অশালীন আচরণ কোনভাবেই বরদাস্ত করতে পারতো না। তাই এরকম অবস্থায় কুন্তীর অভিযোগই হোক বা প্ররোচনা, যে কারণেই হোক, সে রাজদরবারে ছুটে গিয়ে এর বিরোধিতা করল। কিন্তু একবারও ভেবে দেখল না এটা যুধিষ্ঠিরের বাজি ধরবার ফলেই হয়েছে। কেউ তাকে নিজের ভাই বা স্ত্রীকে বাজি ধরতে বলেনি। আর একবার যখন দুর্যোধন, কর্ণেরা অপমান পরিশোধ করবার জায়গা পেয়েছে, তারাও পিছপা হবে না। এটা ঠিকই যে, এই ঘটনা কোনভাবেই ক্ষমাযোগ্য সাধারণ অপরাধ নয়। এখানে গান্ধারীর মতো নারীর এগিয়ে এসে কথা বলাতে যেমন তাঁর নারীমনের উদারতার ছবি প্রকাশিত, অন্যভাবে সে যে আসলে পাণ্ডবদের কূট রাজনীতির শিকার, পরবর্তীতে সেই বোধটাও গান্ধারীর মধ্যে প্রকটিত।

দীপক চন্দ্র অসাধারণ ব্যাখ্যায় বাস্তবতার সাথে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের মতো জঘন্য ঘটনাটির বিশ্লেষণ করেছেন গান্ধারীর দৃষ্টিভঙ্গিতে। গান্ধারী রাতের অন্ধকারে যেন মানসচক্ষু লাভ করেছে। গাঢ় অন্ধকার তাঁর চোখ খুলে দিয়েছে। বিদুর, সঞ্জয়ের প্রকৃত রূপ একবারে মুখোশহীন অবস্থায় ধরা পড়ে তাঁর সামনে। প্রকৃতি দীপক চন্দ্রের লেখায় গান্ধারীর মনের অবস্থার নির্দেশক রূপে কাজ করেছে। দেখা যায় রাতের কালো গান্ধারীর মনের আলো জ্বেলে দিল। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের পেছনের ঘটনা শকুনির কণ্ঠে গান্ধারী শুনতে পেল সেই আধো অন্ধকারে,

> সন্তানের বিরুদ্ধে মাকে দাঁড় করানোর এমন সুন্দর চক্রান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে নেই। সংসার রাজ্যের কোনও ব্যাপারে তুমি থাক না, পাশা খেলার ব্যাপারটাও তুমি জানো না, অথচ কুন্তী তোমার কাছে কেঁদে পড়ল।...পাণ্ডব বিদ্বেষের বীজ বপন করতে তুমি হলে তাদের রাজনৈতিক প্রচারের একটা টোপ। অথচ তুমি জানতেও পারলে না, কীভাবে তাদের চক্রান্তে পা দিলে আর নিজের পুত্রদের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করলে।...তুমিই পৃথিবীর প্রথম জননী যে কিছু না বুঝেই শত্রুপক্ষের কথায় বিশ্বাস করে নিজ পুত্রকে অভিযুক্ত করলো। এবং নিজেই মূল সাক্ষী হয়ে রইলো। নিজের কর্মের একজন বিচারকও বটে।...কিন্তু আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি, সুযোধন কোনও অপরাধ করেনি। ন্যয়ত ধর্মত কোনও দোষ করলে বিদুর চুপ করে থাকতনা। পিতামহ ভীষ্মও দ্রৌপদীর ধর্ম ও ন্যয়ের প্রশ্নের কোনও উত্তর দিতে পারেনি। কেন পারেনি সেকথা একবারও না ভেবে সুযোধনকে অপরাধী করবে কেন?[23]

এই কেন'র সন্ধান করতে গিয়ে শকুনির সন্দেহ গান্ধারীর কাছে আর অহেতুক মনে হল না। পাণ্ডবদের বনবাসে থাকাকালীন সময়ে গান্ধারী বিষয়টা নিয়ে তলিয়ে ভেবেছে। কিন্তু কী পেল আর হারালো'র হিসেব মেলাতে পারেনি। এত কিছুর পরেও পাণ্ডবদের প্রতি মুগ্ধতা সে অস্বীকার করতে পারে না। এখানে আরও

একবার গান্ধারীর চরিত্রের সেই দিক প্রতীয়মান হয় যেখানে রাজনীতির কালিমা তাঁর মনের গৌরবকে একেবারে ম্লান করে দেয় নি। পাণ্ডবদের সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণ নির্ভুল ছিল। বনেই যাদের জন্ম, বনেই তারা আত্মগোপন করেছে বারবার। সাধারণ সমাজের স্তরে নেমে গিয়ে পাণ্ডবদের এই আত্মঅন্বেষণ গান্ধারীকে বিস্মিত না করে পারেনি। কোথাও না কোথাও সেও তাঁর সন্তানদের মধ্যে হয়তো এই মাতৃবাৎসল্য আশা করেছিল। কিন্তু উভয়ের মধ্যেকার দূরত্ব মা হিসেবে গান্ধারী যেমন অতিক্রম করতে পারে নি, তেমনি পারে নি তাঁর প্রিয় সন্তানেরা। বিশেষ করে দুর্যোধন, যে তাঁর মায়ের কাছে ছিল অতি প্রিয় *সুযোধন*।

অন্যদিকে, পাণ্ডবদের এই বনবাস যে স্বেচ্ছানির্বাসন ছিল, যার আসল উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় রাজনীতির হাল-হকিকৎ বোঝা, সেটা গান্ধারী অন্তর্দৃষ্টিতে ফুটে ওঠে। যেমন, রাজসূয় যজ্ঞ ছিল পাণ্ডব এবং শ্রীকৃষ্ণের পাণ্ডব ও যাদব সমবায় বিরোধী রাজন্যবর্গকে চিনে নেবার প্রথম পদক্ষেপ, তেমনি এই নির্বাসন ছিল অন্তিম সজ্জা। নাহলে দেশের অন্যান্য রাজারা কেন নিজেদের সর্বস্ব পণ করতে যাবে এই যুদ্ধে? ঘরোয়া যুদ্ধে শরিক হবার দ্বিতীয় কোনও কারণ নেই। আসলে কুরু-পাণ্ডবের আসন্ন যুদ্ধ শুধুমাত্র সাম্রাজ্য নিয়ে টানাটানির যুদ্ধ হয়েই থাকে নি, তা হয়ে দাঁড়িয়েছিল তামাম ভারতের রাজনীতির ফলাফলের যুদ্ধ যা মহাভারতকে কেন্দ্র করে পরিব্যপ্ত হয়েছে। যে আর্য অনার্যের বিদ্বেষ এতদিন ছাই চাপা পড়েছিল, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের আন্তর্বিরোধ পুঞ্জীভূত হয়েছিল, কুরুক্ষেত্রের রঙ্গমঞ্চে সেই হিসেব নিকেশ চোকানোর পালা বদলের দিন এল। দীপক চন্দ্রের মহাভারতকেন্দ্রিক যাবতীয় রচনাগুলোর মূল সূত্র সেটা।

অতঃপর সবার প্রতীক্ষিত যুদ্ধ শুরু হল। এতদিনের ধারণা অনুযায়ী পাণ্ডবদের যুদ্ধই ন্যায়যুদ্ধ, আর যেটুকু ছলের সাহায্য তারা নিল সেটা হয়েই থাকে। দীপক চন্দ্রই তাঁর লেখায় চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখালেন পাণ্ডবেরা যেটা করেছে সেটা কত বড় অন্যায় ছিল। যে কোন যুদ্ধে অল্প বিস্তর ছল চাতুরির প্রয়োগ হয়েই থাকে, কিন্তু কুরুক্ষেত্রে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ এবং সর্বোপরি দুর্যোধনের উরু ভেঙ্গে যেভাবে হত্যা করা হয়েছিল, সেটা যে কত বড় অধর্ম ছিল, তা একটু বিচার করলেই বোধগম্য হয়। জয়লাভের উদ্দ্যেশে শ্রীকৃষ্ণের প্ররোচনায় ক্ষাত্রধর্ম ত্যাগ করা পাণ্ডবদের যুদ্ধকেই এতদিন সকলে সমর্থন করে এল। আধুনিক সমালোচকেরা, সাহিত্যিকেরা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ যে অধর্মের যুদ্ধে পরিণত হয়েছিল, সকলেই একথা একবাক্যে স্বীকার করেন। দীপক চন্দ্র সেই চিরচেনা চরিত্রগুলোকেই আবার দেখালেন। সেই দেখার মধ্যে কোন অতিরঞ্জনের ছোঁয়া নেই। বরং অনেক বেশী যুক্তিযুক্ত। কৌরববংশ, যাদের শঠতাই সকলের মস্তিষ্কে গাথা, তারাই যেন কোথায় মধুসূদনের মেঘনাদের মত বীরত্বে মৃত্যুকে স্বীকার করে নিয়েছে।[২৪] দুর্যোধন তাঁর আসন্ন মৃত্যুকে অবলোকন করেও তাঁর মাকে যা বলেছিল, তা যতই সাহিত্যের আধারে লেখা হোক না কেন, সেই দর্শন আধুনিক পাঠককে বাকরুদ্ধ করে দেয়। গান্ধারীকে সান্ত্বনা দেবার জন্য সে বলেছিল,

> মা, চুপ করো। এই যুদ্ধের পরিণাম আমি জানি। কৌরববংশের ধ্বংস হতে আর দেরি নেই। শেষ অঙ্ক শেষ হবে আমাকে দিয়ে।... আমাকে দুর্বল করে দিওনা। যদি তোমার কথা সত্য হয় – 'যথাধর্ম তথা জয়' তাহলে এ যুদ্ধে আমি জিতব। আমি

> কোনও অধর্ম করিনি। চিরদিন জীবনের সর্বক্ষেত্রে জিতেছি, জেতার জন্যই তো বেঁচে আছি।[২৫]

বীর পুত্র সুযোধনের মৃত্যু গান্ধারীকে জীবন্মৃত করে দিয়েছিল। চারপাশের মহামৃত্যুকে দেখে গান্ধারীর প্রস্তরবৎ আচরণই স্বাভাবিক। এই পরিণামের জন্যই বিধাতা তাঁকে এতদিন ধরে তৈরি করেছিল। উপন্যাসের সমাপ্তিও অনবদ্য। শ্রীকৃষ্ণকে শাপ দেবার জন্য গান্ধারী উদ্যত হলে কৃষ্ণের জননী ডাক তাঁকে অন্তর থেকে শান্ত করে দেয়। এক সুগভীর প্রশান্তি তাঁর হৃদয়ে ছেয়ে যায়। এত শোকের পরে এই শান্তিটার দরকার ছিল গান্ধারীর। তাঁর চরিত্রের আরও একটা সুন্দর দিক উদ্ভাসিত হল - হাজারো শোকের যন্ত্রণা নিয়েও যে ক্ষমাশীল মানসিকতার প্রদর্শন গান্ধারী করে, তাতে তাঁর চরিত্রের সর্বংসহা রূপটিই ফুটে উঠেছে।

পরিশেষে বলা যায়, দীপক চন্দ্রের গান্ধারী মহাভারতের ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে গেছে। উপন্যাসটির মধ্যে দিয়ে দীপক চন্দ্রের বিশ্লেষণ পরিষ্কার। ব্যাসদেবের নির্ধারিত ধর্মের পথে থাকতে গিয়ে এই নারী নিজের অজান্তেই মাতৃধর্মের বিরোধিতা করেছে। কৃন্তী যেখানে নানা অধর্মের কাজ করেও যেভাবে ধর্মের নামে শাসন চালিয়েছে, সেই দৃঢ়তা গান্ধারীর চরিত্রে বিরল। গান্ধারী যথা ধর্ম তথা জয় নামক মহাভারতের মনগড়া এক ধারণার শিকার। তাঁর বিয়েটাই যে এক রাজনৈতিক শর্তের ফলে হয়েছিল, সেই অতীত সে ভুলে গেল। কোনরকম সাবধানতা অবলম্বন করল না ব্যাসদেবের গান্ধারী, অথচ কুন্তী তাঁর অতীত কখনোই বিস্মৃত হয় নি। এভাবে ভালো করে লক্ষ্য করলে ব্যাসদেবের পক্ষপাতিত্ব চোখে পড়ে। তাই ন্যায়ধর্ম বজায় রাখতে গিয়ে অর্থাৎ সৎ পথে থাকতে গিয়ে গান্ধারী নিজের মাতৃধর্ম থেকেই বিচ্যুত হয়ে গেছে। জীবিত অবস্থায় এই নারী শান্তি পায়নি। রাজনীতির ফাঁদ তাঁর মানসিক শান্তির সাথে যেভাবে লেপটে ছিল, তা সব ছারখার করেই ছেড়েছে। পরস্পরবিরোধী মানসিকতায় জেরবার হয়ে গিয়েছে নারী চরিত্রটি। দীপক চন্দ্র এখানেই মহাভারতের এক নতুন ব্যাখ্যা করেছেন গান্ধারী চরিত্রটির হাত ধরে। গান্ধারী সারাজীবন সত্যের পথে চলেছিল। তাহলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধশেষে কেন গান্ধারী কৃষ্ণকে অভিশাপ দিতে চায়? যুধিষ্ঠিরকে তিরস্কার করে? এর একটাই কারণ, গান্ধারীর ভ্রম ভেঙ্গে গিয়েছিল। যে সন্তানদের এতদিন অবহেলায় দূরে সরিয়ে রাখল, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধই তাঁকে চিনিয়ে দিল আসল সত্য। ধর্ম-অধর্ম ও রাজনীতির ক্রূর চক্রান্ত ফাঁস হয়ে গিয়েছিল। অমানবিক যন্ত্রণা পেয়েছে সেদিন গান্ধারী। ঔপন্যাসিকের হাতে পড়ে পৌরাণিক চরিত্রটি এভাবে তাঁর পুরাণের মোড়ক থেকে বেরিয়ে এল। সমস্ত ট্র্যাজেডি নিজের চোখে দেখল। কুরুক্ষেত্রের অন্তিম দিনে তাঁর হাহাকার প্রথম শোনা গেল, যাকে সে সবসময় চাপা দিয়ে এসেছিল। এখানেই চরিত্রটির উত্তরণ। যেখানে কৃষ্ণকে অভিশাপ দেওয়াটা গান্ধারীর জন্যে মহাকবির সামান্য সহানুভূতি প্রদর্শন ছিল, সেখানেই গান্ধারী কৃষ্ণের 'মা' ডাকে শান্তি পেয়েছে। এটাই অন্যতর এক মানসবোধের সংযোজন করে উপন্যাসটিতে। এই মানবী গান্ধারীর মুক্তির প্রয়োজন ছিল। দীপক চন্দ্রের গান্ধারী এভাবেই নবনির্মাণে অনন্যমাত্রায় ভাস্বর হয়ে উঠল।

সূত্রনির্দেশ

[১] দীপক চন্দ্র শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই নয়, সারা বিশ্বে একজন জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক হিসাবে সুপরিচিত। ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনীটির বিচিত্র এবং আকর্ষণীয় উপাখ্যানগুলির উপর ভিত্তি করে তাঁর সৃজনশীল কল্পিত উপন্যাসগুলি (এখনও অবধি ৮৫) রচিত হয়েছে। পুরাণ বিষয়ে একাধিক গল্পগ্রন্থও রচনা করেছেন তিনি। ভগিনী নিবেদিতা, শ্রীচৈতন্যদেবের ওপরেও তাঁর চিন্তনশীল উপন্যাস রয়েছে। এ বাদেও তিনি বেশ কিছু সামাজিক উপন্যাস ও ছোটগল্প সমগ্র রচনা করেছেন। দীপক চন্দ্রের কথাসাহিত্য পাঠক শ্রেণীর মধ্যে সুপাঠ্য ও জনপ্রিয় এবং তাঁর পৌরাণিক রচনাধারা বাংলা সাহিত্যে একটি বিশেষ ঘরানা তৈরি করেছে।

[২] সাহিত্যিক দীপক চন্দ্র তার মহাকাব্য নির্ভর লেখাগুলোতে বিশ্লেষণাত্মক চিন্তাধারা প্রয়োগ করেছেন। রামায়ণ-মহাভারত উভয় কাব্যের মধ্যে যে বিষয়গুলোতে অতিনাটকীয়তা ও দৈব প্রভাব আছে, সেখানেই তিনি তাঁর উপযুক্ত কারণ অনুসন্ধান করেছেন। বিশেষ করে, মহাভারত নিয়ে তাঁর লেখা কথাসাহিত্যে যুক্তি দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন মহাকবি ব্যাসদেব সকলের প্রতি নিরপেক্ষ আচরণ করেন নি। পাণ্ডবদের এভাবে জিতিয়ে দেবার পেছনের রহস্য দীপক চন্দ্রকে আকর্ষণ করেছে। সেখানে কৃষ্ণ থেকে শুরু করে ভীষ্ম, দ্বৈপায়ন, কুন্তী, সত্যবতী প্রায় প্রতিটি চরিত্রকে মহাকাব্যিক পরিমণ্ডল থেকে বের করে তাদের স্বার্থ খুঁজেছেন। তাঁর 'শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম', 'মহাভারতের পাশা', 'মহাভারতের পঞ্চমাতৃকা' ইত্যাদি ও আরও অন্যান্য বইগুলোতে মহাভারতের মূল উদ্দেশ্য কি ছিল, লেখকের দৃষ্টিতে তা যেমন ধরা পড়েছে, তেমনই মহাভারতের জোড়াতালি দেওয়া ঘটনাগুলোর কার্যকারণ খুঁজে দেখা হয়েছে।

[৩] দীপক চন্দ্রের পূর্বে পৌরাণিক উপন্যাস ধারা বলে পৃথক কোনও ধারা সাহিত্যজগতে ছিল না। মহাকাব্য থেকে উপাদান নিয়ে বাংলা সাহিত্যে অন্যান্য ধারায় লেখালেখি হলেও উপন্যাস ধারায় এর প্রচলন খুবই কম ছিল। সমরেশ বসু, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, প্রমথনাথ বিশী প্রমুখের মতো সাহিত্যিকেরা এক-দুটির বেশি এই ধারায় উপন্যাস লেখেন নি। একমাত্র দীপক চন্দ্র একাধিক গল্প-উপন্যাস নির্মাণ করে বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক উপন্যাস নামে একটি ধারা বলবৎ করতে সক্ষম হলেন। তবে দীপক চন্দ্র ব্যতীত কোন সাহিত্যিকই এরকম সুগভীর আগ্রহ প্রকাশ করেন নি। তবে বর্তমানে পুরাণের নানা কাহিনীকে কেন্দ্র করে উপন্যাস রচনার প্রবণতা বাংলা সাহিত্যে লক্ষ্য করা গিয়েছে। এক্ষেত্রে তিলোত্তমা মজুমদার, বাণী বসু প্রমুখের নাম নেওয়া যায়।

[৪] দীপক চন্দ্র, *গান্ধারী, কুরুক্ষেত্রের গান্ধারী,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮৭, ষষ্ঠ সংস্করণ ২০০৫।

[৫] বাণী বসু, *ক্ষত্রবধূ,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৭।

[৬] সিন্ধুনদের পশ্চিমতীর থেকে আফগানিস্তানের অধিকাংশকে পুরাকালে গান্ধার দেশ বলা হতো। বর্তমান কান্দাহারই হলো প্রাচীন গান্ধার নগরী।

[৭] সুধীরচন্দ্র সরকার, 'গান্ধারী', *পৌরাণিক অভিধান,* এম.সি.সরকার প্রাঃ লিমিটেড, কলকাতা, সন ১৩৬৫, পৃ. ১৫২ ।

[৮] সুধীরচন্দ্র সরকার, 'ধৃতরাষ্ট্র', *পৌরাণিক অভিধান,* এম.সি.সরকার প্রাঃ লিমিটেড, কলকাতা, সন ১৩৬৫, পৃ. ২০৭।

[৯] মহাভারতের ঘটনা থেকে জানা যায়, হস্তিনাপুরের সাথে গান্ধার (বর্তমান কান্দাহার) দেশের মধ্যে সাম্রাজ্যের লড়াই আগাগোড়াই ছিল। শেষপর্যন্ত গান্ধার যুদ্ধে পরাজিত হলে তাদের মধ্যে এক সন্ধিচুক্তি হয়। ভীষ্ম তার অন্ধ ভ্রাতষ্পুত্র ধৃতরাষ্ট্রের জন্যে রাজকুমারী গান্ধারীকে দাবি করেন, তখন পিতা সুবল ও ভাই শকুনি সমগ্র গান্ধারের ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে তাতে সম্মতি দিতে বাধ্য হন। গান্ধারীর পছন্দ অপছন্দের কোন কথা মহাভারতে সেভাবে উল্লেখ নেই। তার বিয়ে পুরোটাই ছিল গান্ধারকে মুক্তি দেবার শর্ত। এই সব অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্যেই শকুনি পরবর্তীতে হস্তিনাপুরে চলে আসে এবং নিজের পরিকল্পনামাফিক কাজ করে।

[১০] দীপক চন্দ্র, দৃষ্টিকোণ, *শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম,* প্রথম অখণ্ড সংস্করণ ১৯৮৬, দে'জ সংস্করণ ১৯৮৯, পুনর্মুদ্রণ ২০১২, কলকাতা, পৃ. ১০।

[১১] দীপক চন্দ্র, দৃষ্টিকোণ, *গান্ধারী, কুরুক্ষেত্রের গান্ধারী,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮৭, ষষ্ঠ সংস্করণ ২০০৫।

[১২] দীপক চন্দ্র, দৃষ্টিকোণ, *গান্ধারী, কুরুক্ষেত্রের গান্ধারী,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮৭, ষষ্ঠ সংস্করণ ২০০৫।

[১৩] দীপক চন্দ্র, মহাভারতে শকুনি, *মহাভারতের পাশা,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

[১৪] দীপকচন্দ্র, *গান্ধারী, কুরুক্ষেত্রের গান্ধারী*, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৭, ষষ্ঠ সংস্করণ ২০০৫, কলকাতা, পৃ.১১।

[১৫] দীপক চন্দ্র, স্বয়ংবরের কন্যা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

[১৬] বাণী বসু, *ক্ষত্রবধূ,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৭।

[১৭] দীপক চন্দ্র, *মাদ্রীর কণ্ঠস্বর,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ১৯।

[১৮] এই বিষয়ে বিস্তারিত জানবার জন্যে দীপক চন্দ্রের লেখা *পিতামহ ভীষ্ম, কুরুক্ষেত্রে দ্বৈপায়ন, যোজনগন্ধা সত্যবতী* ইত্যাদি রচনা পড়ে দেখতে হবে।

[১৯] দীপক চন্দ্র লিখিত *সম্রাজ্ঞী কুন্তী* উপন্যাসটি প্রসঙ্গত পাঠ্য।

[২০] দীপক চন্দ্র, *গান্ধারী, কুরুক্ষেত্রের গান্ধারী,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮৭, ষষ্ঠ সংস্করণ ২০০৫, পৃ. ৩৬।

[২১] বন্ধুদায়াদ অর্থ বোঝানো হয়, কোন নারীর বিবাহপূর্ব সন্তান পরবর্তীতে তাঁর মায়ের বৈবাহিক পিতার সম্পদের অধিকার পাবেন। সেদিক দিয়ে সত্যবতী পুত্র দ্বৈপায়ন শান্তনুর পরিবারের বন্ধুদায়াদ হিসাবে স্বীকৃত। মহাভারতে স্বৈরিণীর পুত্রকেও পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বলা হয়েছে। শামিম আহমেদ, *মহাভারতে দ্রৌপদী,* গাঙচিল, কলকাতা, ২০১৩, 'পাণ্ডবানী' অংশ।

[২২] দীপক চন্দ্র, *যোজনগন্ধা সত্যবতী,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৭, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১১।

[২৩] দীপক চন্দ্র, *গান্ধারী, কুরুক্ষেত্রের গান্ধারী,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮৭, ষষ্ঠ সংস্করণ ২০০৫, পৃ. ৯৪।

[২৪] মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এ রামায়ণের কাহিনীর নবনির্মাণ ঘটিয়েছিলেন। সেখানে রাজা রামের পরিবর্তে রাক্ষসরাজ রাবণ ও তার বীর পুত্র মেঘনাদের ওপর বীরত্ব আরোপ করা হয়েছিল। প্রচলিত চিন্তাভাবনার বিপরীতে গিয়ে মহাকাব্যটির যে যুক্তি বুদ্ধির মিশেল করেছিলেন মাইকেল, তেমনই দীপক চন্দ্রের হাতেও মহাকাব্যগুলি নানান ভাবে চর্চিত হয়েছে। আধুনিক যুক্তিবাদী জিজ্ঞাসায় রামায়ণ-মহাভারতের এই বিশ্লেষণগুলি অনবদ্য।

[২৫] দীপক চন্দ্র, *গান্ধারী, কুরুক্ষেত্রের গান্ধারী,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮৭, ষষ্ঠ সংস্করণ ২০০৫, পৃ. ১২৭।